দারিদ্র্য, বৈষম্য ও জাতীয় বাজেট

ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ (১৪ জুন, ২০০৮)

"যারে তুমি নীচে ফেল,
সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে।
পশ্চাতে রাখিছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে
অজ্ঞানের অন্ধকারে ঢাকিছ যারে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমান হতে হবে তাদের সমান।"
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের বাজেট জাতির সামনে উত্থাপন করেছেন। মোট ৯৯,৯৬২ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ২৫,৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে 'বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি' বা এডিপি খাতে। বাজেটে অনুন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ৭৪,৩৬২ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ৬৯,৩৮২ কোটি টাকা। মোট ঘাটতি ৩০,৫৮০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫ শতাংশের সমতুল্য। ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে ৬,৩৪৬ কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদান, ৭,২৩৬ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ এবং ১৬,৯৯৮ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় উপদেষ্টা তাঁর বাজেট বক্তৃতায় প্রস্তাবিত বাজেটে *সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা এবং দারিদ্র্য নিরসনের* প্রতি অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এসব লক্ষ্য অর্জনে তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনা, কৃষি উৎপাদন বাড়ানো, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি দ্রুততর করা এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সার্বিক যোগাযোগ কাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

নিঃসন্দেহে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। একইসাথে জরুরি দারিদ্র্য নিরসনের ওপর অগ্রাধিকার, কারণ উচ্চহারের সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে দরিদ্ররাই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে – নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি অনেক পরিবারকে দরিদ্রের কাতারে সামিল করেছে। একইভাবে জরুরি সমাজে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান। কারণ সমাজে বিরাজমান ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পর্বত প্রমাণ বৈষম্য রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতাকেই হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পারে। বস্তুত দারিদ্র্য ও বৈষম্য আমাদের পায়ের নীচে টিক টিক করা একটি তাজা বোমার সমতূল্য। প্রস্তাবিত বাজেট দারিদ্র্য ও বৈষম্য, যা মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ, নিরসনে সম্ভাব্য কী ভূমিকা রাখবে তা মূল্যায়ন করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

দারিদ্র্যের ব্যাপকতা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সকল সরকারই দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। এ লক্ষ্যে অনেক কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে। দাতাগোষ্ঠী এ কাজে অনেক অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তা সত্ত্বেও দারিদ্র্য আমাদের দেশ থেকে নির্মুল হয়ে যায় নি। বরং দারিদ্র্য এখনও আমাদের বিরাট জনগোষ্ঠীর জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী।

আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনামলের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব মতে, ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৫৯ শতাংশ আয়ের দিক থেকে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করছিল। ২০০০ সালে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশে। অর্থাৎ আমাদের প্রথম দু'টি গণতান্ত্রিক শাসনামলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাৎসরিকভাবে গড়ে প্রায় এক শতাংশ হারে কমেছে। এটি কোনভাবেই একটি বিরাট অর্জন নয়, বিশেষত আমাদের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক রাষ্ট্রের তুলনায়।

দারিদ্র্যসীমার নীচে জনগোষ্ঠী

দারিদ্র্যসীমার নীচের জনগোষ্ঠীর অনুপাত	১৯৯১-৯২	১৯৯৫-৯৬	২০০০	২০০৫	২০০৮
জাতীয়	৫৬.৬	৫০.১	৪৮.৯	৪০.০	৪৮.৫
গ্রামাঞ্চল	৫৮.৭	৫৪.৫	৫২.৩	৪৩.৮	
শহরাঞ্চল	৪২.৭	২৭.৪	৩৫.২	২৮.৪	

সূত্রঃ পরিকল্পনা কমিশন, "মুভিং এহেডঃ ন্যাশনাল স্ট্র্যাটিজি ফর এক্সিলারেটেড পোভার্টি রিডাকশন, ২০০৯-২০১১," মে ২০০৮। ২০০৮-এর তথ্যের সূত্র সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, "বাংলাদেশ ইকোনমি ইন ২০০৭-০৮: এন ইনটেরিম রিভিউ অব ম্যাক্রোইকোনমি পারফরমেন্স," (জুন ২০০৮)।

তবে সাম্প্রতিক, ২০০৮ সাল পূর্ব, অভিজ্ঞতা কিছুটা আশাব্যঞ্জক। বর্তমান শতাব্দির প্রথম ৫ বছরে দারিদ্র্যের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হারে কমেছে। ফলে ২০০০ সালের তুলনায় ২০০৫ সালে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৯ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। এদের মধ্যে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০০০ সালের ৩৪ শতাংশের তুলনায় এখন হ্রাস পেয়েছে ২৫ শতাংশে। লক্ষ্যণীয় যে, গত ৫

বছরে শহরের তুলনায় গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা কমেছে বেশি হারে, যদিও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে ২০০৮ সালে এসে এই সকল অর্জন ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

১৯৯১-০৫ সময়কালে আয় দারিদ্র্য অপেক্ষাকৃত বেশি হারে কমলেও ক্যালরি গ্রহণের ভিত্তিতে পরিমাপ করা দরিদ্রের সংখ্যার অনুপাত তেমন উল্লেখযোগ্য হারে কমে নি। আমাদের মোট জনসংখ্যার মধ্যে দৈনিক ২১২২ ক্যালরির কম গ্রহণ করা ব্যক্তির হার ১৯৯১-৯২ সালের ৪৭.৫ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ৪০.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রেও গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাসের হার শহরাঞ্চলের তুলনায় বেশি।

এছাড়াও ১৯৯১-০৫ সময়কালে মোট জনসংখ্যায় দরিদ্রদের আনুপাতিক হার হ্রাস পেলেও আমাদের সমাজে মোট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে নি, বরং বেড়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে যেখানে ২১২২ ক্যালরির কম গ্রহণ করা ব্যক্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৫,১৬ কোটি, সেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৩ কোটি এবং ২০০০ সালে ৫.৫৮ কোটিতে। ২০০৫ সালে তা বেড়েছে ৫.৬০ কোটিতে, যা বর্তমানে ৭.৫০ কোটিতে পৌঁছেছে বলে অনেকে আশংকা করছেন। তাই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সময়সীমা ২০১৫ সালের মধ্যে – যে সময়সীমার মধ্যে দরিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামানোর কথা – আমাদের দেশে দরিদ্রদের সংখ্যা বাড়বে বৈ কমবে বলে মনে হয় না।

দারিদ্র্য নিরসনের ক্ষেত্রে অতীতে আমাদের উল্লেখযোগ্য অর্জন থাকলেও, চলতি বছরের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে সে অর্জন বহুলাংশে ধূলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। 'সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ' (সিপিডি)-এর একটি সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ পরিবার নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে। ২০০৫ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী গড়ে একটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ। এই হিসাবে নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমেছে এক কোটি ২১.২৫ লক্ষ মানুষ। এর ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশে এসে পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি দুঃসংবাদ।

দরিদ্রদের সংখ্যা ও দারিদ্র্যের হার নির্ণয় করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে। প্রথাগতভাবে সে সকল ব্যক্তিকেই 'দরিদ্র' বলা হয় যারা তাদের কতগুলো পূর্বনির্ধারিত ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা (যেমনঃ পুষ্টি, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদি) মেটাতে অক্ষম হয়। ন্যূনতম ক্যালরি প্রাপ্তির ভিত্তিতেও দারিদ্র্যের পরিমাপ করা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের আয় (যেমনঃ ডলার-এ-ডে, টু ডলার-এ-ডে) করলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে মনে করা হয়। এ সকল সংজ্ঞার মাধ্যমে মানুষের দৈহিক শ্রমশক্তি অক্ষুন্ন রাখার ওপরই প্রাধান্য দেয়া হয়, মানুষ হিসেবে তার অন্যান্য চাহিদাকে (যেমন, আত্মমর্যাদাবোধ, সৃষ্টিশীলতা ইত্যাদি) সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। তাও এতে আবার বর্তমান আয়ের মাধ্যমে বর্তমান দৈনিক শ্রমক্ষমতার স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় – বৃদ্ধ বয়সের আয় ও ভবিষ্যতের দৈনিক শ্রমক্ষমতার স্থিতিশীলতার ওপর নজর দেয়া হয় না। ক্ষুধা-দারিদ্র্যের এ সকল সনাতন ধারণা মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো অগ্রাহ্য করে মৌলিক দেহ ধারণের চাহিদার ওপরই জোর দেয়, যা নিঃসন্দেহে অমানবিক। অধ্যাপক আনিসুর রহমানের মতে, "এগুলো গরুর দারিদ্র্যের সংজ্ঞা"। কারণ এতে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবা হয় না, বরং গবাদি পশু হিসেবেই গণ্য করা হয়।

গতানুগতিক সংজ্ঞায় আয়ের অভাবই দারিদ্র্য এবং আয় বৃদ্ধিই দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় হিসেবে ধরা নেয়া হয়। 'রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ অফ বাংলাদেশ' আয়োজিত এক সাম্প্রতিক সেমিনারের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণা, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, মর্যাদাহীনতা; ভূমি দখল ও বাসস্থান সমস্যা; পেশাচ্যুতি ও জীবিকা সংক্রান্ত সমস্যা; নিরাপত্তাহীনতা ও নারী নির্যাতন; তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চনা, পরিবেশ বিপর্যয়, আইনী সহায়তা না পাওয়া ও বিচারিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া; মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ না পাওয়াও দারিদ্র্যের একইসাথে কারণ ও প্রতিফলন। ("জাতীয় উন্নয়ন নীতি ও বাজেট প্রণয়নে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা" শীর্ষক সেমিনার, ৪ জুন, ২০০৮) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য জনগণের, বিশেষত সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির জন্য এই সকল সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। তবে সাথে সাথে তাদের আয়ও বাড়াতে হবে, যার কোন বিকল্প নেই।

এছাড়াও দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। যার স্বল্প আছে, সে বেশি চায় বলেই সে দরিদ্র্য বলে নিজেকে ভাবে। আর সে বেশি চায়, কারণ অন্যের বেশি আছে – সে অন্যের সাথে নিজেকে তুলনা করে এবং অন্যের সমতুল্য হতে চায়। লক্ষণীয় যে, মানুষ ছাড়া প্রাণীকূলে দরিদ্র নেই, কারণ তাদের বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। বস্তুত প্রাণীকূলে একমাত্র মানুষই দরিদ্র হতে পারে।

ক্রমবর্ধমান অসমতা

গত দেড় দশকে – বর্তমান বছরের আগ পর্যন্ত – বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুপাত কিছুটা কমলেও, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হয়েছে আরো প্রকট। ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে বস্তুত আমরা একটি অসম সমাজে পরিণত হচ্ছি। এ অসমতা শুধু আয়ের ক্ষেত্রেই নয়, এটি সুযোগের ক্ষেত্রেও বিরাজমান। আর আয় ও সুযোগের বৈষম্যই প্রতিভাত হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। তাই দরিদ্ররা সামাজিকভাবে হয় উপেক্ষিত এবং রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন। তাদেরকে সমাজে অনেকটা 'ভেড়ার পাল' হিসেবে গণ্য করা হয়।

আয়ের বৈষম্য

জিনি অনুপাত	১৯৯১-৯২	২০০০	২০০৫*

জাতীয়	০.২৫৯	০.৪৫১	০.৪৬৭
গ্রামাঞ্চল	০.২৪৩	০.৩৯৩	০.৪২৮
শহরাঞ্চল	০.৩০৭	০.৪৯৭	০.৪৯৭

সূত্রঃ হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিচার সার্ভে (অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট), ২০০৬। ১৯৯১-৯২ সালের তথ্য পিআরএসপি, ২০০৫ থেকে নেয়া হয়েছে।

অসমতার প্রচলিত পরিমাপ হলো জিনি কোইফিশিয়েন্ট (Gini coefficient)। জিনি কোইফিশিয়েন্টের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে ব্যক্তি কিংবা পরিবারের মধ্যে আয় অথবা ভোগের বিভাজন কতটুকু বৈষম্যমূলক – পরিপূর্ণ সমতা থেকে কতটুকু বিচ্যুত – তা পরিমাপ করা হয়। জিনি কোইফিশিয়েন্ট ১ হলে পরিপূর্ণ সমতা এবং ০ হলে সম্পূর্ণ অসমতা বিরাজমান।

গত দেড় দশকে জিনি কোইফিশিয়েন্টের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, জাতীয়ভাবে ১৯৯১-৯২ সালের তুলনায় ২০০০ সালের অসমতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে শেষ পাঁচ বছরে জাতীয়ভাবে অসমতার চিত্র অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে অসমতা কিছুটা বাড়লেও শহরে এ অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে এ সকল তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে তথ্য বিকৃত করার অনেক অভিযোগ রয়েছে।

জিনি কোইফিশিয়েন্ট-এ শেষ ৫ বছরে তেমন কোন অসমতা ধরা না পড়লেও, জাতীয় পর্যায়ে পারিবারিক আয় বন্টনের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বেড়েছে। সরকারি তথ্য মতে, আমাদের দেশে ৫ শতাংশ সর্বাধিক ধনী পরিবারের জাতীয় আয়ের শেয়ার ১৯৯১-৯২ সালের ১৮.৮৫ শতাংশ থেকে ২০০৫ সালে ২৬.৯৩ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে দেশের ৫ শতাংশ দরিদ্র পরিবারের শেয়ার ১.০৩ শতাংশ থেকে ০.৭৭ শতাংশে নেমে এসেছে। অর্থাৎ ১৯৯১-৯২ সালে ধনী-দরিদ্রের আয়ের বৈষম্য ছিল যেখানে ১৮ গুণ ২০০৫ সালে এসে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫ গুণে। অর্থাৎ আমাদের গণতান্ত্রিক শাসনামলে আয়ের অসমতা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে – এটি একটি ভয়াবহ পরিস্থিতি।

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বন্টন

পরিবার গ্রুপ	১৯৯১-৯২			১৯৯৫-৯৬			২০০০			২০০৫		
	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর	জাতীয়	পল্লী	শহর
সর্বনিম্ন দরিদ্র ৫%	১.০৩	১.০৭	১.০৯	০.৮৮	১.০০	০.৭৪	০.৯৩	১.০৭	০.৭৯	০.৭৭	০.৮৮	০.৬৭
সর্বোচ্চ ধনী ৫%	১৮.৮৫	১৭.৮০	১৯.৪২	২৩.৬২	১৯.৭৩	২৪.৩০	২৮.৩৪	২৩.৫২	৩১.৩২	২৬.৯৩	২৩.০৩	৩০.৩৭
(সর্বোচ্চ ৫% /(সর্বনিম্ন ৫%)	১৮			২৭			৩০			৩৫		

সূত্রঃ হাউজহোল্ড ইনকাম এন্ড এক্সপেনডিচার সার্ভে, ২০০১ ও ২০০৫।

বাজেটে দারিদ্র্য নিরসনের বরাদ্দ

দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা আগামী অর্থবছরের ৯৯,৯৬২ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ২,১৭১ কোটি টাকা কর্মসংস্থান ও উন্নয়নখাতে ব্যয় করার প্রস্তাব করেছেন। বিদায়ী অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় তা হলো ১,১২৫ কোটি টাকা বেশি। এ বরাদ্দ অনুন্নয়ন খাতের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, এ খাতে বিদায়ী অর্থবছরের মূল বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১,৫১১ কোটি এবং সংশোধিত সম্ভাব্য ব্যয় ১,০৪৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিদায়ী অর্থবছরে অনুন্নয়ন খাত থেকে কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ৪৬৫ কোটি টাকা কম ব্যয় হবে বলে অর্থ উপদেষ্টা ধারণা করছেন।

মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা তার বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রস্তাবিত বাজেটে ১৬,৯৩২ কোটি টাকা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রেখেছেন, কর্মসংস্থান কর্মসূচি যার অংশ। আরো বরাদ্দ রেখেছেন ১৩,৬৬৮ কোটি টাকা জ্বালানী, খাদ্য ও কৃষি উপকরণের জন্য ভর্তুকি হিসেবে। এছাড়াও ১০,২৫৩ কোটি টাকা শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতনখাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অনুন্নয়ন বাজেট থেকে এ সকল অর্থ বরাদ্দ হলেও, এগুলো কার্যত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বলে তিনি দাবি করেছেন।

দারিদ্র্য নিরসনে এবং বৈষম্য দূরীকরণে বাৎসরিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এডিপি সর্বাধিক ভূমিকা রাখে বলে ধারণা করা হয়। আগত অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত এডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ২৫,৬০০ কোটি টাকা। বিদায়ী বছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ছিল ২৬,৫০০ কোটি টাকা, যা পরবর্তীতে সংশোধন করে ২২,৫০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে – অর্থাৎ সংশোধিত এডিপি প্রস্তাবিত এডিপি'র তুলনায় ১৫ শতাংশ কম। প্রস্তাবিত এডিপি বিদায়ী অর্থবছরের প্রাক্কলিত এডিপি'র পরিমাণ থেকেও ৩.৪ শতাংশ কম। দশ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি ধরে নিলে এ হার দাঁড়াবে ১৩.৩ শতাংশ। প্রস্তাবিত এডিপি, জিডিপি'র ৪.২ শতাংশের সমতূল্য, ১৯৯১ সালের পর যা সর্বনিম্ন। বস্তুত এডিপি প্রস্তাবিত মোট বাজেটের প্রায় ২৫ শতাংশ, যেখানে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে এ অনুপাত ছিল ৪০ শতাংশের বেশি।

মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা বাস্তবায়নের সমস্যার কারণে এডিপি'র বরাদ্দের পরিমাণ কমিয়েছেন বলে দাবি করেন। তিনি তার বাজেট বক্তৃতায় স্বীকার করেছেন যে, প্রতিবছর এডিপি'র প্রায় ২০ শতাংশ ব্যয় হয় না। বিদায়ী অর্থ বছরের বাস্তবায়নের হার আরো হতাশাব্যঞ্জক। অর্থ বছরের প্রথম দশ মাসে মূল এডিপি বরাদ্দের ৪৭ শতাংশ এবং সংশোধিত এডিপি'র ৫৫ শতাংশ মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এডিপি বাস্তবায়ন একটি বড় চলমান সমস্যা। তবে মাননীয় উপদেষ্টা মোট বাজেটের পরিমাণ বড় করেও এডিপি'র আকার ছোট করেছেন মূলত জ্বালানী, খাদ্য ও কৃষি উপকরণের ওপর ভর্তূকি এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতার ভিত্তিতেই তিনি তা করেছেন।

লক্ষণীয় যে, এডিপি'র পরিমাণ কমানো এবং এডিপি বাস্তবায়নের হার হতাশাব্যঞ্জক হলেও, অনুন্নয়নখাতে প্রস্তাবিত রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকি বিদায়ী অর্থ বছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটেও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে – বিদায়ী অর্থ বছরের অনুন্নয়ন খাতের প্রাক্কলিত রাজস্ব বাজেট ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬০,৬৩৭ কোটি থেকে ৭১,১০৮ কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ সরকার পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও, এর কার্যকারিতা, বিশেষত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর দক্ষতা ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে বলে অনেকের আশংকা। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদায়ী অর্থ বছরে অনুন্নয়নখাতে ব্যয় বৃদ্ধির একটি বড় কারণ হলো জ্বালানী তেল, খাদ্যদ্রব্য ও কৃষি উপকরণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভর্তূকি প্রদান।

প্রস্তাবিত বাজেটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে, এতে কর্মসংস্থানের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে '১০০ দিনের কর্মসৃজন' শীর্ষক একটি কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ দরিদ্র কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে ভবিষ্যতে একটি গ্যারাণ্টি স্কীমের মতো করে গড়ে তোলার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও বাজেটে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউণ্ডেশন, এনজিও ফাউণ্ডেশন ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের জন্য ৫২৬ কোটি টাকা এবং সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণের জন্য ১৩১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। আরো প্রস্তাব করা হয়েছে 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা' হিসেবে ২৭০ কোটি টাকা, 'দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা' হিসেবে ২১.৬ কোটি টাকা, 'শহরের নিম্ন আয়ের কর্মজীবি মা'দের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা' হিসেবে ২০ কোটি টাকার বরাদ্দ। উপরন্তু, 'গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন' (ভিজিডি), 'গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও রাস্তা সংরক্ষণ,' এতিমখানাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'খোরাকি ভাতা', বেসরকারি এতিমখানায় 'ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট,' সিডর কবলিত এলাকার এতিমদের জন্য 'আমাদের শিশু,' মঙ্গা পীড়িত এলাকার জন্য 'স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম', 'বয়স্ক ভাতা' কর্মসূচি, 'যুদ্ধাহত অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা', 'অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা', 'জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনকে পুনর্গঠন', 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি', 'মঙ্গা নিরসন', চর এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য 'চর জীবিকায়ন কর্মসূচি', পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ, পুষ্টি, মা ও শিশুর পরিচর্যা কার্যক্রমের জন্য 'পার্বত্য অঞ্চলে পাড়াকেন্দ্র কর্মসূচি', বাস্তহারাদের জন্য 'গৃহায়ন তহবিল', 'ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান' কর্মসূচির জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত বাজেট কী দারিদ্র্য-বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হবে?

প্রস্তাবিত বাজেট দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসনে সহায়ক হবে যদি এর মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি – যাতে দরিদ্ররাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় – সহনীয় পর্যায়ে আসে, দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় এবং তারা সম্পদের ন্যায্য হিস্যা পায়। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা এ সকল ক্ষেত্রে কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যার কিছু কিছু প্রশংসনীয়। তবে তাঁকে সাধুবাদ যে, তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতায় 'দরিদ্রবান্ধব প্রবৃদ্ধি'র কথা বলেন নি, কিংবা সামাজিক 'অন্তর্ভুক্তিকরণে'র কথা একবারও উচ্চারণ করেন নি। অতীতে দরিদ্রবান্ধব শ্লোগান ব্যবহার করে আমরা দরিদ্রদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি এবং অন্তর্ভুক্তিকরণের বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে আমরা নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাই (উদাহরণ, স্থানীয় সরকারে নারী আসন) করেছি।

বর্তমান বছরের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির, বিশেষত, চালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য নিঃসন্দেহে সরকারের অদূরদর্শিতা দায়ী। সরকার আগে থেকে খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানি করলে সঙ্কট কিছুটা লাঘব হতো। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানীর দামে ব্যাপক উর্ধ্বগতি আমাদের মুদ্রাস্ফীতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। আন্তর্জাতিক বাজারে যে উত্তাপ বিরাজমান তা ভবিষ্যতে লাঘব হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। তবে ইরি-বোরোর বাম্পার ফলন এবং অধিক হারে ভর্তুকি দিয়ে খাদ্য, সার, জ্বালানী ইত্যাদির বাজার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টার ফলে মুদ্রাস্ফীতির ওপর কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে মূল্য

নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও এর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদিভাবে উৎপাদন কিছুটা বাড়াতে হলে কৃষকদের জন্য সার, বিদ্যুৎ ও ডিজেলের যোগান দেওয়া জরুরি। সবকিছু বিবেচনা করে মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে এনে দরিদ্রদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আগত অর্থ বছরে বেশি কিছু আশা করা দুরাশা হবে।

কর্মসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। '১০০ দিনের কর্মসৃজন' কর্মসূচি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। তবে এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করতে গেলে অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় সমস্যা দেখা দেবে বলেই অনেকের ধারণা। তাই প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে। এছাড়াও এটি হবে বর্তমান সরকারের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আশার কথা যে, মাননীয় উপদেষ্টা তাঁর বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় হলেও, কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হতে হবে বেসরকারি ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। আর এ জন্য আবশ্যক বিনিয়োগ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে বিনিয়োগের হার দ্রুতহারে বাড়ছে না। বস্তুত দেশজ উৎপাদনের বা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে আমাদের দেশে বিনিয়োগের হার গত কয়েক বছরে হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এই হার ছিল ২৪.৭ শতাংশ, ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৫ শতাংশে এবং বর্তমান বছরে তা ২৪.২ শতাংশে হ্রাস পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়াও বর্তমান বছরে প্রবৃদ্ধির হারও কমে ৬.২ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। উপরন্তু বৈদেশিক বিনিয়োগের হালও বর্তমানে স্থবির।

তবে প্রস্তাবিত বাজেটকে অনেকেই ব্যবসাবান্ধব বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং আশা করছেন যে, এর মাধ্যমে বিনিয়োগের হার বাড়বে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাড়তি বাজেট ঘাটতি এবং সরকারের আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে অধিক পরিমাণে ঋণগ্রহণ বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সরকারের অত্যাধিক ঋণ গ্রহণের 'ক্রাউডিং আউট এফেক্ট' (crowding out effect) হতে পারে। অর্থাৎ সরকারের ঋণ গ্রহণের ফলে বাজারে তারল্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে, ফলে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ ঋণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এছাড়াও ঋণের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে সুদের হারও বেড়ে যেতে পারে, যার প্রভাব বিনিয়োগের ওপর নেতিবাচক হতে বাধ্য। উপরন্তু ব্যপক দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের অভিযোগে অভিযুক্ত বেসরকারি খাতে যদি শৃঙ্খলা ফিরে না আসে তাহলে ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক সমাজ থেকে বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বড় অবদান আশা করা যায় না।

গবেষকদের মতে, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুব মহিলা কর্মসংস্থানের খোঁজে শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। ধারণা করা হচ্ছে যে, আগামী অর্থ বছরে অন্তত ১২ লক্ষ ব্যক্তি শ্রম বাজারে প্রবেশ করবে। এ বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের যোগান দেয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় এবং যথার্থও নয়। আমাদের বেসরকারি খাতেও দ্রুত হারে প্রসার লাভ করছে না। তাই আত্মকর্মসংস্থানই মূল ভরসা। দুর্ভাগ্যবশত এ লক্ষ্যে বাজেটে কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। শুধুমাত্র বার্ড ফ্লু'র কারণে ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদেরকে ১৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে বলে বাজেট বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন পুঁজির। একইসাথে প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের। আত্মকর্মসংস্থানের দ্রুতহারে বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদ্যোগে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুঁজি যোগানের সাথে সাথে বেসরকারি উদ্যোগে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যেগে প্রশিক্ষিত আত্মশক্তিতে বলিয়ান উজ্জীবকদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা প্রদান করা যেতে পারে।

দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করতে হলে অবশ্যই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে অধিক হারে সম্পদ পৌঁছাতে হবে। তাদের ন্যায্য হিস্যা তাদেরকে দিতে হবে। একইসাথে ঐতিহাসিকভাবে তারা যে বঞ্চিত হয়েছে তা পূরণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

একটি অতি সহজ অংকের মাধ্যমে জাতীয় বাজেটে দরিদ্রদের ন্যায্য হিস্যা নিরূপণ করা যায়। আমাদের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের আকার ৯৯,৯৬২ কোটি টাকা এবং এডিপি ২৫,৬০০ কোটি টাকা। উভয় বাজেট ১৫ কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন করলে মাথাপিছু পড়বে যথাক্রমে ৬,৬৬৪ টাকা ও ১৭০৭ টাকা। অর্থাৎ জাতীয় বাজেটে প্রত্যেক নাগরিকের হিস্যা ৬৬৬৪ টাকা এবং এডিপি'তে ১৭০৭ টাকা। এই হিসাব মতে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জাতীয় বাজেট ও এডিপি'তে তাদের হিস্যা যথাক্রমে ৩৩,৩২০ টাকা ও ৮,৫৩৩ টাকা। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ টাকা তাদের হিস্যা, প্রাপ্য নয়। এই টাকার একটি বিরাট অংশ কেন্দ্রিয় সরকার ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যয় হওয়ার কথা, যা থেকে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি সেবা পাওয়ার কথা। আরেকটি অংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয় হওয়ার কথা, যাতে তারা কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। এই বিশাল অংকের পরিমাণ সেবা কি জনগণ পায়? অনেকের ধারণা, এ বিশাল অংকের অর্থ দিয়ে যে শ্বেত হস্তি লালন করা হচ্ছে তা তাদের যতটুকু উপকার করে, তার চেয়ে বেশি অপকারই করে। অনেকের মতে, প্রিডেটরি (predatory) বা লুণ্ঠনকারী সরকার উপকারের পরিবর্তে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধনই করে।

আর এ বিশাল অংকের সরকারি ব্যয়ের ক্ষুদ্র অংশই তৃণমূল পর্যায়ের সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে। কয়েক বছর আগে একটি ইউনিয়নে বিভিন্ন উৎস থেকে বাৎসরিক কত টাকা ব্যয় হয় তা বর্তমান লেখক নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছিল। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার ফতেপুর

ইউনিয়নে, যেখানে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের প্রশিক্ষিত উজ্জীবকদের উদ্যোগে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ প্রথম প্রকাশ্য বাজেট অধিবেশনের আয়োজন করেন, এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। প্রায় ২৫ হাজার জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ফতেপুর ইউনিয়নের ২০০১-০২ সালের জাতীয় বাজেটে'র ও এডিপি'র হিস্যা ছিল যথাক্রমে ৮.৩৫ কোটি ও ৩.৬৬ কোটি টাকা। কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে ইউনিয়নে ব্যয় হয়েছে এক কোটি টাকার মতো, যা জাতীয় বাজেটের হিস্যার মাত্র ১২ শতাংশ। আর এডিপি খাত থেকে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা, যা এডিপি'র হিস্যার মাত্র ৯ শতাংশ। ফতেপুর ইউনিয়নে মোট এক কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে মাত্র ২৩ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়েছিল ইউনিয়ন পরিষদের সম্পৃক্ততায়, যার মধ্যে পরিষদে প্রদত্ত এডিপি বরাদ্দ ছিল মাত্র তিন লক্ষ টাকা। বাকি ৭৮ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়েছে উপজেলার মাধ্যমে, যার মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন ছিল প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা। ফতেপুরবাসীদের হিস্যার বাকি ৮৮ শতাংশ বা ৭.৩৫ (৮.৩৫ - ১ কোটি) টাকা ব্যয় হয়েছে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, যার সামান্য অংশই তৃণমূলের জনগণের কাছে প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছেছে।

বস্তুত কেন্দ্রিয় সরকারের ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি শহরকেন্দ্রিকতা বা শহরের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। একটি বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা যায়। গত মাসে বর্তমান লেখক তিনটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাক-বাজেট সভায় অংশগ্রহণ করেছিল। কুড়িগ্রামের প্রায় ৩৮ হাজার জনগোষ্ঠী সম্বলিত একটি ইউনিয়ন পরিষদের (বিশ্বব্যাংক প্রদত্ত এলজিএসপি গ্রান্ট বাদে) সম্ভাব্য বাজেট ছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা, যার প্রায় ৮ লক্ষ টাকাই ছিল কেন্দ্রিয় সরকার থেকে প্রাপ্ত এডিপি গ্রান্ট, টিআর-কাবিটা ও বেতনভাতা। তার পাশেই একটি পৌরসভা – উলিপুর পৌরসভা – যার ২০০৮-০৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেট ৭.০২ কোটি টাকা, যার মধ্যে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা নিজস্ব উৎস থেকে সংগৃহিত। উলিপুর পৌরসভার জনসংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজার। অর্থাৎ একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পৌরসভার জন্য যেখানে সম্ভাব্য ব্যয় ৭ কোটি টাকার ওপর সেখানে একই এলাকার একটি ইউনিয়নের জন্য সম্ভাব্য ব্যয় মাত্র ১০ লক্ষ টাকা – দুই ক্ষেত্রেই টাকার সিংহভাগ সরকার ও অন্যান্য বাইরের উৎস কর্তৃক প্রদত্ত। এর সাথে আরো তুলনা করা যায় রংপুর পৌরসভার, যার জনসংখ্যা আনুমানিক ৪ লক্ষ। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিশ্রুত রংপুর পৌরসভার পাইপলাইনে বর্তমানে আনুমানিক ৮৪ কোটি টাকা রয়েছে, যা ব্যয় করার সঙ্গতি পৌরসভার নেই। তাই আগামী অর্থবছরে তাদের সম্ভাব্য বাজেট হবে আনুমানিক ৪১ কোটি টাকার। এ সকল তথ্য থেকেই আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামের প্রতি বৈষম্যের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে – দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অধিকাংশ জনগণ এখনো গ্রামে বসবাস করে এবং তাদের অধিকাংশই দরিদ্র।

শুধু বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেই নয়, প্রচলিত প্রবৃদ্ধিনির্ভর উন্নয়ন কৌশলও দরিদ্রবিমুখ। এই কৌশলের মূল কথা হলো, বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বাড়লে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। এটি পুরনো ট্রিকল ডাউন (trickle down) বা 'চুইয়ে পড়া' অর্থনীতির ধারণা। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত এ ধারণা আমাদের দেশে এবং অনেক দেশেই কাজ করে নি। কারণ প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির স্বাস্থ্য কিছুটা পরিমাপ করলেও তা অধিকাংশ জনগণের সত্যিকারের আর্থসামাজিক অবস্থা নিরুপণে অপারগ। উপরন্তু প্রবৃদ্ধির ওপর জোর দেয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৈষম্য সৃষ্টি হয়। অভিজ্ঞতা তাই বলে। এছাড়াও প্রবৃদ্ধি সাধারণত দরিদ্রবান্ধব হয় না। আমাদের দেশেও তা হয় নি।

এডিপি'র অপেক্ষাকৃত ছোট আকার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর তার সম্ভাব্য নেতিবাচক ফলাফলের ব্যাপারে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। একইসাথে প্রশ্ন তোলা দরকার এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের মান সম্পর্কে। সমাজে প্রতিপত্তিশালীদের প্রভাবে অনেক সময় এমন সব প্রকল্প এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত হয় যার কোন অর্থনৈতিক যৌক্তিকতাই অনুপস্থিত। তাই এডিপি'র আকার বড় হলেই তা দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এমন আশা করা ঠিক নয়। এছাড়াও এডিপি বাস্তবায়নের হার বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি। এর জন্য প্রয়োজন হবে বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে সম্পদ হস্তান্তর। উপরন্তু, শিক্ষক ও ডাক্তারদের বেতন – যে শিক্ষক ও ডাক্তাররা মানসম্মত সেবা দেন না, অনেকক্ষেত্রে কোন সেবাই দেন না – উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে গণ্য করা কতটুকু যৌক্তিক? প্রসঙ্গত, সর্বাধিক দারিদ্র্যপীড়িত বিভাগগুলোর জন্য মাথাপিছু এডিপি বরাদ্দ সর্বাধিক নয়।

প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাননীয় অর্থ উপদেষ্টা তার বাজেট বক্তৃতায় দাবি করেছেন যে, "দারিদ্র্য বিমোচন ব্যয়কে অধিকহারে অগ্রাধিকার দেয়া(র) ... কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলে মোট ব্যয় হবে বাজেটের প্রায় ৫৮.৩ শতাংশ (জিডিপি-র ৯.৫ শতাংশ)।" এ সকল ব্যয়ের একটি তালিকা পাওয়া গেলে তা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা সম্ভব হতো। আশা করি, সরকার ও আমাদের অর্থনীতিবিদরা এ ব্যাপারে দৃষ্টি দিবেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বাজেটে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সুরক্ষাখাতে কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও বরাদ্দ থাকলেও, এর ফলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ফলাফল আশা করা যায় না। উল্লেখযোগ্য হারে দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন হবে ছকবাঁধা পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ের পরিবর্তে, এটিকে ঢেলে সাজানো, কারণ আমাদের বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখন বস্তুত অটো-পাইলটে। তা না হলে যে লক্ষ্য সামনে রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে, ফলাফল তার উল্টো হতে পারে। যেমনি হয়েছে বর্তমান অর্থ বছরে। উল্লেখ্য যে, বিদায়ী বাজেটের লক্ষ্য ছিল: সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, প্রবৃদ্ধির গতিধারা ত্বরান্বিত করা, মুদ্রাস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা, ব্যক্তিখাত চালিত প্রবৃদ্ধির বাধাগুলো দূর করা, দারিদ্র্য কমিয়ে আনা, অঞ্চল ও শ্রেণীভিত্তিক আয় সমতা তৈরি এবং খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলা।